স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

এইচআইভি ও এইডস
প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পরামর্শ

অরুন্থিয়া জায়দী উর্মি
আইসিডিডিআর,বি

এইচআইভি (Human Immunodeficiency Virus-HIV) এক ধরনের ভাইরাস। ভাইরাস হচ্ছে খুবই ছোট একটি জীবাণু। এটি এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। এই জীবাণু যখন শরীরে প্রবেশ করে, তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে শরীর অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থাকে এইডস (Acquired Immunodeficiency Syndrome-AIDS) বলা হয়ে থাকে। এইচআইভি-র শেষ পরিণতি হচ্ছে এইডস।

এইচআইভি এবং এইডসের মধ্যে পার্থক্য

এইচআইভি হচ্ছে একটি ভাইরাস আর এইডস হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা যা এইচআইভি সংক্রমণের কারণে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তি ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, যেমন: তীব্র ডায়রিয়া, জ্বর, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি। একজন এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তি এই ধরনের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে তখন আমরা বলি তাঁর এইডস হয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইডসের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এই লক্ষণগুলো নির্ভর করে একজন ব্যক্তির রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং তিনি যেসব রোগে আক্রান্ত তার ধরনের ওপর। একজন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি কাউন্সেলর এবং ডাক্তারের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ ও অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসা গ্রহণ করে দীর্ঘদিন সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন।

এইচআইভি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে ফেললে কী হয়

এইচআইভি শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়, ফলে সংক্রমিত হওয়ার ২ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এইডস হয়। এই পর্যায়ে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা আংশিকভাবে নষ্ট হলেও এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তি তখনও শক্তিশালী থাকেন। ফলে এসময় বিভিন্ন রোগের জীবাণু শরীরে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।

এইচআইভি সংক্রমণের বিভিন্ন ধাপ

সাধারণত অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসা ছাড়া ১০-৩০% লোকের এইডস দেখা দেয় ৩ বছরে এবং ৭০-৯০% লোকের এইডস দেখা দেয় ১০ বছরের মধ্যে।

নিচের চিত্রে এইচআইভি ও এইডসের বিভিন্ন ধাপগুলো দেখানো হলো:

এইচআইভি সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থা

- ১ থেকে ৩ মাস রক্তে এইচআইভি ধরা পড়ে না
- সংক্রমিত ব্যক্তি অন্যের শরীরে এই ভাইরাস ছড়াতে পারেন

এইচআইভি পজিটিভ কিন্তু এইডস নয়

- ২-১০ বছর পর্যন্ত সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন
- কোনো রোগের লক্ষণ দেখা যায় না
- অন্যের শরীরে এইচআইভি ছড়াতে পারেন

এইডসের প্রাথমিক অবস্থা

- এসময় নানাবিধ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করেন
- অন্যের শরীরে এইচআইভি ছড়াতে পারেন

এইডসের শেষ অবস্থা

- ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল হয়ে পড়ে
- খুব সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন
- অন্যের শরীরে এইচআইভি ছড়াতে পারেন

এইচআইভি কীভাবে ছড়ায়

যৌনমিলনের মাধ্যমে

পৃথিবীতে এইচআইভি সংক্রমণের সবচেয়ে সক্রিয় মাধ্যম হচ্ছে যৌনমিলন। বিষমকামী (নারী-পুরুষ) যৌনমিলন এবং সমকামী (পুরুষ-পুরুষ) যৌনমিলনের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। যৌনমিলন বলতে বোঝায় যোনিপথ, পায়ুপথ এবং মুখের ভেতরে যৌনাঙ্গ প্রবেশের মাধ্যমে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে মেলামেশা। অরক্ষিতভাবে যোনিপথ, পায়ুপথ এবং মুখের ভেতরে যৌনাঙ্গ প্রবেশের মাধ্যমে এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির সাথে যৌনমিলন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে প্রবেশ এবং বহির্গমনের পথে সঠিক স্থানে ভাইরাসের উপস্থিতির ওপর। মুখের ভেতরে কোনো প্রকার কাটা বা ঘা, মাড়িতে রক্ত বা মাড়ি থেকে রক্ত-পড়া রোগ এবং যৌনাঙ্গে কোনো কাটা বা ঘায়ের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়াতে পারে।

এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত, রক্তজাতীয় উপাদান অথবা অঙ্গ/কলা স্থাপনের মাধ্যমে

এইচআইভি এন্টিবডি পরীক্ষা না করে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সময় এবং দূষিত সুঁই-সিরিঞ্জ পুনরায় ব্যবহার অথবা দূষিত চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে দূষিত রক্তের সংস্পর্শে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত বা রক্তজাতীয় উপাদান ব্যবহার বা নেশা করার উদ্দেশ্যে এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁই-সিরিঞ্জ অপর নেশাকারী ব্যবহার করলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে থাকে।

মা থেকে শিশুর দেহে এইচআইভি সঞ্চালন

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইচআইভি-পজিটিভ মায়ের মাধ্যমে শিশুরা জন্মের আগে, জন্মের সময় বা জন্মের পর এইচআইভি পজিটিভ হয়। কোনো

ভেতরের পাতায়

- বাড়ন্ত শিশুদের খাবারে অনীহা
- শারীরিক ক্রিয়াকলাপ: ক্রনিক ডিজিজ প্রতিরোধে আপনার ঢাল
- কচি ঘাঘরা শাক থেকে সাবধান!

বর্ষ ২০ | সংখ্যা ২
অগ্রহায়ণ ১৪১৮ | নভেম্বর ২০১১
ISSN 1021-2078

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায়

যৌনরসের মাধ্যমে (পুরুষের বীর্য ও মহিলার যোনীরস)

- যোনিপথে যৌনমিলন
- পায়ুপথে যৌনমিলন
- মুখমৈথুন (মুখ দিয়ে যৌনাঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ চোষা)

যৌনমিলনের সময় এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তি কনডম ব্যবহার না করলে তার সঙ্গীর দেহে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে।

এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত, রক্তজাতীয় উপাদান বা অঙ্গ/কলা স্থাপনের মাধ্যমে

এইচআইভি রক্তের মধ্যে বেঁচে থাকে। এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত আপনার শরীরে প্রবেশ করলে আপনিও আক্রান্ত হবেন।

সংক্রমিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে অথবা ব্যবহৃত সুঁচ ও সিরিঞ্জে লেগে থাকা অল্প পরিমাণ সংক্রমিত রক্তের মাধ্যমে এইচআইভি অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

এইচআইভি সংক্রমিত মা থেকে শিশুতে

মা এইচআইভি পজিটিভ হলে কোনো কোনো শিশু মায়ের কাছ থেকে এইচআইভি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

এছাড়া পরবর্তীকালে মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমেও শিশু সংক্রমিত হতে পারে।

চিকিৎসাব্যাতীত এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হয়। উন্নয়নশীল দেশে এই ঝুঁকি ২৫% থেকে ৪০% এর মতো বলে অনুমান করা হয়।

একজন ব্যক্তি কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তার ওপর তাঁর সংক্রমিত হবার ঝুঁকি অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন: স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে দুর্ঘটনাবশত সুঁই দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকির চেয়ে সংক্রমিত রক্ত দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তেমনি, অরক্ষিতভাবে মুখের মাধ্যমে যৌনক্রিয়ার চেয়ে অরক্ষিতভাবে পায়ু ও যোনিপথে যৌনক্রিয়ার ফলে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেশি। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের কারণেই প্রধানত মানুষের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে।

এইচআইভি কীভাবে ছড়ায় না

এটি মনে রাখা জরুরী যে, এইচআইভি মানুষের সাধারণ মেলামেশার মাধ্যমে ছড়ায় না, যেমন: হাত মেলানো, জড়িয়ে ধরা, স্পর্শ করা, চুমু খাওয়া, ইত্যাদি। একই টয়লেট অথবা সাঁতারের জায়গা ব্যবহার, খাবারের জিনিষপত্র ব্যবহার বা একই মশার কামড়ের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় এমন কোনে প্রমাণও পাওয়া যায় নি। যেসব সাধারণ ক্রিয়াকলাপে এইচআইভি ছড়ায় না তা ছবির সাহায্যে পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হলো।

এইচআইভি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়

- যৌনসঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখা বা প্রতিবার যৌনমিলনের সময় সঠিক নিয়মে কনডম ব্যবহার করা।
- এইচআইভি পরীক্ষা ছাড়া রক্ত সঞ্চালন বা কোনো ব্যক্তির অঙ্গ অথবা টিস্যু অন্যের দেহে প্রতিস্থাপন না করা।
- একই চিকিৎসা সরঞ্জাম একাধিক ব্যক্তির জন্য ব্যবহার না করা।
- একই সুঁই বা সিরিঞ্জ অনেকে মিলে ব্যবহার করে নেশা গ্রহণ না করা।
- এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত এবং সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো বা না খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত ডাক্তারের পরামর্শ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সঠিক কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে নেওয়া।

বিশ্বব্যাপী এইচআইভি এবং এইডস পরিস্থিতি

গ্লোবাল এইডস এপিডেমিক (২০১০)-এর ওপর ইউএনএআইডিএস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৯ সালের শেষে ৩০.৮ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২.৫ মিলিয়ন শিশু এইচআইভি নিয়ে জীবন যাপন করে। ২০০৯ সালে মোট ২.৬ মিলিয়ন মানুষ নতুনভাবে এইচআইভি-তে আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৩,৭০,০০০টি শিশু আছে বলে ধারণা করা হয়। এই শিশুদের বেশিরভাগই এইচআইভি-পজিটিভ মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায়, জন্মের সময় বা বুকের দুধ পান করার মাধ্যমে এইচআইভি-পজিটিভ হয়েছে। এইডসজনিত মৃত্যু ১.৮ মিলিয়ন বলে প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা সম্ভবত ২০০৪ সালে সর্বোচ্চ ছিলো এবং ২০০৪ সাল থেকে ২০০৯ সালে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসা বৃদ্ধির ফলে ১৯% কমেছে।

যেসব সাধারণ ক্রিয়াকলাপে এইচআইভি ছড়ায় না

- সাধারণ মেলামেশা, যেমন: হাত মেলানো, কোলাকুলি করা, স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়ার মাধ্যমে
- এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির সেবাযত্ন করলে
- এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করলে
- শরীর থেকে নির্গত বিভিন্ন তরল পদার্থ, যেমন: ঘাম, মুখের লালা, বমি বা মলমূত্র প্রভৃতি স্পর্শ করলে

- একই বাসনে খাবার খেলে বা একই গ্লাসে পানীয় পান করলে
- এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির সংগে কাজ করলে
- এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির সংগে একই ক্লাসে পড়াশুনা করলে

- একই পায়খানা ব্যবহার করলে
- একই জলাশয়ে সাঁতার কাটলে বা একই পানির উৎস্য ব্যবহার করে গোসল করলে
- মশা বা পোকা মাকড়ের কামড়ের মাধ্যমে
- এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির তৈরি করা খাবার খেলে

বাংলাদেশে এইচআইভি এবং এইডস পরিস্থিতি

বাংলাদেশ এইচআইভি-র প্রেক্ষাপটে কম ঝুঁকিপূর্ন দেশ, যেখানে মোট জনগণের ০.১%-এরও কম এইচআইভি আক্রান্ত বলে ধারণা করা হয়। এদেশে রোগটি দেখা দেওয়ার ৪ বছর আগে ১৯৮৯ সালে প্রবাসী কর্মীসহ জনগণের মধ্যে যারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাদের জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই জাতীয় কর্মসূচি এইচআইভি-র ব্যাপকতা কমিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। জাতীয় তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৪ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৭,৫০০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুঁই-সিরিঞ্জের সাহায্যে নেশা গ্রহণকারী (আইডিইউ)-দের মধ্যে এইচআইভি এবং এইডসের ব্যাপকতা বেশি। জাতীয় এইডস এবং এসটিডি প্রোগামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২,০৮৮ জন এইচআইভি-পজিটিভ লোক এবং ৮৫০ জন এইডস রোগী পাওয়া যায় এবং ২৪১ জন রোগী এইডসে মারা যায়। ২০১০ সালে ৩৪৩ জন নতুন রোগী সনাক্ত করা হয়, ২৩১ জনের মধ্যে এইডস বিকাশ লাভ করে এবং ৩৭ জন মারা গেছে বলে খবর পাওয়া যায়। ভৌগলিক এবং জনগণের আচরণগত, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে খুব শীঘ্রই এই বৃদ্ধি মহামারীর আকারে বৃদ্ধি পেতে পারে।

বাংলাদেশে ২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এইচআইভি-পজিটিভ লোক, এইডস রোগী এবং এইডসজনিত মৃত্যু

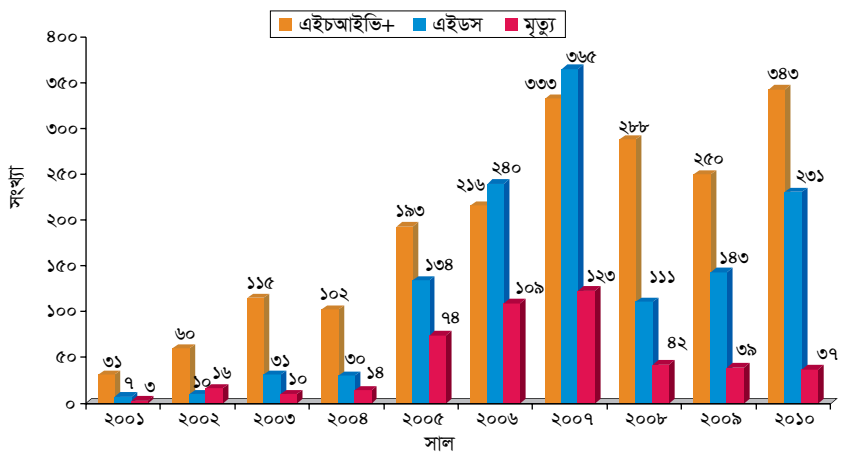

এইচআইভি কীভাবে সনাক্ত করা হয় ও এইচআইভি পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ কেন

একজন ব্যক্তি এইচআইভি-তে আক্রান্ত কী না তা জানার একমাত্র উপায় হলো তাঁর রক্ত পরীক্ষা করা। এইচআইভি-তে আক্রান্ত হলেও একজন ব্যক্তি বহুদিন সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকতে এবং নিয়মিত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন। এইচআইভি সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এভাবে নিজের অজান্তে এইচআইভি জীবাণু বহন করছে এবং অন্যের শরীরে এইচআইভি ছড়াচ্ছে। এইচআইভি-র চিকিৎসা যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় তত ভালো, দেরী করে চিকিৎসা শুরু করলে সেই চিকিৎসা কার্যকর হয় না। এজন্য, রক্ত পরীক্ষা করে দ্রুত এইচআইভি নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কখন এইচআইভি পরীক্ষা করা উচিত

শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি, ধনী বা গরীব, বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কেউ এইচআইভিতে আক্রান্ত হতে পারেন। কেউ যদি সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার না-করে অনেকের সাথে যৌনমিলন করে থাকেন, অন্যের ব্যবহৃত সুঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করে থাকেন অথবা এইচআইভি পরীক্ষা করা হয় নি এমন রক্ত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাঁর এইচআইভি-তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া, এইচআইভি-তে আক্রান্ত মা থেকে তার সন্তানের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত এইচআইভি পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

জাগরী একটি সম্পূর্ণ ও উন্নতমানের এইচআইভি পরামর্শ, পরীক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র

ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি বা কলেরা হাসপাতালে 'জাগরী'-নামক একটি এইচআইভি পরামর্শ, পরীক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে যাত্রা শুরু করার পর থেকে জাগরী উন্নতমানের সেবা দিয়ে আসছে। এইচআইভি ও এইডসই শেষ কথা নয়। এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েও দীর্ঘদিন সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপন করা সম্ভব। এ-ব্যাপারে জাগরী আপনাকে সবধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। জাগরী আপনাকে দিচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা করে সহজ উপায়ে এইচআইভি পরীক্ষা করার সুবিধা।

জাগরী আপনাকে কীভাবে সাহায্য করবে

এইচআইভি কাউন্সেলিং ও পরীক্ষা

জাগরীতে আছে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা ও পুরুষ মনোবিজ্ঞানী, যারা নিয়মিতভাবে এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে কাউন্সেলিং বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রক্ত পরীক্ষার আগে আপনি কাউন্সেলরের কাছ থেকে এইচআইভি ও যৌনরোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং এইচআইভি পরীক্ষার সুবিধা সম্পর্কে ধারণা পাবেন। আপনার সম্মতি থাকলে এইচআইভি ও যৌনরোগ সিফিলিস পরীক্ষার জন্য আপনার হাত থেকে অল্প পরিমাণে রক্ত নেওয়া হবে। পরীক্ষার ফলাফল শুধুমাত্র আপনাকেই কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে জানানো হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে এইচআইভি ও সিফিলিস পরীক্ষার সম্পূর্ণ সঠিক ফলাফল নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

পরীক্ষার ফলাফল এইচআইভি নেগেটিভ হলে

পরবর্তীকালে আপনার আবার পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে কী না তা আপনি কাউন্সেলরের কাছ থেকে জানতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে আপনি কীভাবে এইচআইভি থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাবেন।

পরীক্ষার ফলাফল এইচআইভি পজিটিভ হলে

সাফল্যের সাথে এই অবস্থার মোকাবিলা করার এবং এই ভাইরাস নিয়ে সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে কাউন্সেলরের কাছ থেকে পরামর্শ পাবেন। আপনার যৌনসঙ্গী বা অন্য কারোর দেহে যাতে এই ভাইরাস ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারে কাউন্সেলর আপনাকে বিস্তারিত পরামর্শ দেবেন। এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তিদের সাহায্য করে থাকে এমন বিভিন্ন সেবাকেন্দ্র সম্পর্কেও এখানে জানতে পারবেন।

চিকিৎসাসেবা

বহির্বিভাগে চিকিৎসা

জাগরীতে এইচআইভি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক আছেন, যার কাছ থেকে আপনি ওষুধ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ এবং যৌনরোগ ও এইচআইভি-সংশ্লিষ্ট অসুস্থতার জন্য সঠিক চিকিৎসা পাবেন।

হাসপাতাল সেবা

এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৮ সালের মে মাসে আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে জাগরী ওয়ার্ড-নামক একটি অভ্যন্তরীণ চিকিৎসাসেবা ইউনিট খোলা হয়েছে। এখানে জাগরীর ডাক্তার, নার্স ও মনোবিজ্ঞানীগণ এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তিদের নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যসেবা এবং কাউন্সেলিং সেবা দিয়ে থাকেন।

সেবা প্রদানের সময়

বহির্বিভাগ

সকাল ৮:৩০ থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। শুক্রবার, শনিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন বন্ধ।

এইচআইভি পরীক্ষার জন্য সকাল ৮:৩০ থেকে ১১:৩০-এর মধ্যে আসলে একইদিনে বিকেল ৩টার পরে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

হাসপাতাল

এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে জাগরী ওয়ার্ড প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে।

পরামর্শ এবং রক্ত পরীক্ষার ফিস মাত্র পঞ্চাশ টাকা! অন্যান্য চিকিৎসাসেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে!

জাগরীর ঠিকানা

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালী, ঢাকা ১২১২
(মেইন গেইট দিয়ে প্রবেশ করে অগ্রণী ব্যাংক ভবনের ২য় তলায়)

ফোন
+৮৮৬০৫২৩-৩২
এক্সটেনশান: ২৪৩৬ (জাগরী আউটডোর ভিসিটি)
এক্সটেনশান: ২৩৭৫ (জাগরী ওয়ার্ড)

মোবাইল
০১৭১৩ ০৪০৯৪০

ইমেইল
jagori@icddrb.org

আসুন এইচআইভি পরীক্ষা করি, চিন্তামুক্ত আগামী গড়ি

জাগরীতে কীভাবে আসবেন

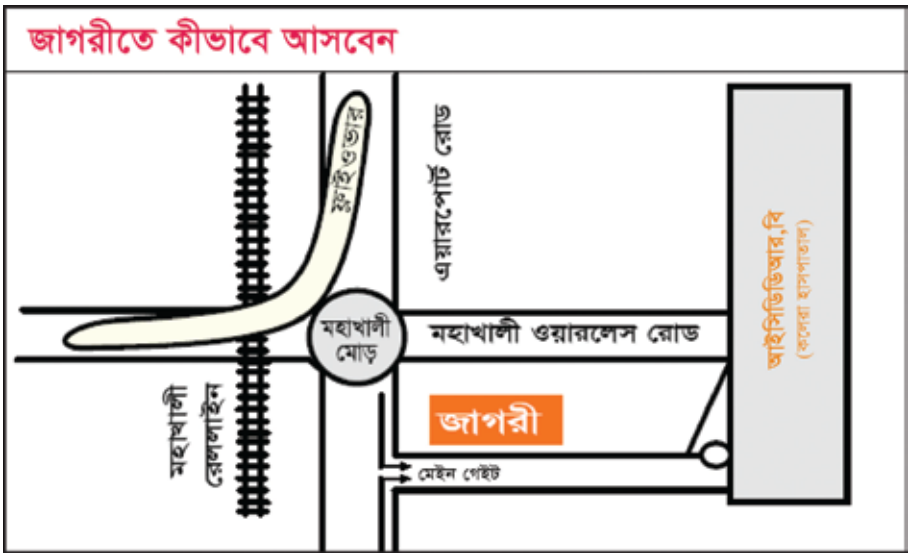

বাড়ন্ত শিশুদের খাবারে অনীহা

লায়লা ফারজানা
আইসিডিডিআর,বি

দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের প্রায়ই খাবার খেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। হয়তো দেখা যায় তারা যথেষ্ট পরিমাণে খাচ্ছে না বা নির্দিষ্ট কিছু খাবার খাচ্ছে। এই প্রবণতা অনেক অভিভাবককে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। এমন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেক অভিভাবক রকমারি খাবার দিয়ে থাকেন, এমনকি ভিটামিন প্রয়োগ করে রুচি ফেরানোর চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু তারপরও দেখা যায় অনেক শিশুকে অভিভাবকেরা পুষ্টি তালিকার সব উপাদান খাওয়াতে না পেরে হতাশ হচ্ছেন। তাই, এই পরিস্থিতিতে মূল সমস্যাটি কোথায় তা অভিভাবকদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। সত্যিই কী শিশুর খাবারে অনীহা তার অরুচি থেকে নাকি খাবার পরিবেশন বা অভিভাবকের কোনো আচরণগত ত্রুটি তার অনীহার কারণ?

খাবারে প্রচণ্ড অনীহার ফলে শিশুটি না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস

সাধারণত দুই বছর বয়স থেকে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির হার আগের তুলনায় কমে যায়। কারণ, তাদের পুষ্টির চাহিদা এ-বয়সে হ্রাস পেতে থাকে, ক্ষুধা কমতে শুরু করে, এমনকি এসময় তারা কী ধরনের খাবার খাবে তা অনুমান করাও কঠিন হয়ে পরে। কখনো কখনো শিশুর কোনো একটি নির্দিষ্ট খাবারের প্রতি ঝোঁকের সৃষ্টি হয়। হয়তো দেখা গেল দু'সপ্তাহ ধরে প্রতিবেলা সে কেবল নুডলসই খেতে চাচ্ছে। সে যথেষ্ট পুষ্টি পাচ্ছে না এ-কথা মনে করে অধৈর্য্য হলে চলবে না। শিশুটিকে সময় দিন, কিছুদিন পর সে নিজে থেকেই অন্য খাবার গ্রহণ করবে। সাধারণত এই বয়সে তাদেরকে পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা থেকে খাবার দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের খাবারের ধরনে আসে পরিবর্তন, যেমন: সুজি এবং পাতলা খিচুরীর পরিবর্তে শক্ত ভাত, রুটি, মাংস প্রভৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। এসব স্বাভাবিক খাবার হজম করতে পাতলা খাবারের চেয়ে বেশি সময় দরকার হয়। খাবারের ধরনের এই পরিবর্তন তাদের ক্ষুধা কমে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ হতে পারে।

খাবারের পরিমাণ

শিশু কতটুকু খাবে তা একেক শিশুর ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে। দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুর জন্য তিন বেলা ভারী খাবার এবং দুই বেলা নাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে খাবারের পরিমাণ এবং কতবার তা দেওয়া হবে হবে তা শিশুভেদে ভিন্ন হতে পারে। শিশুর খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করার একটি ভালো উপায় হচ্ছে শিশুর বয়স অনুপাতে প্রত্যেক ধরনের খাবার এক টেবিল চামচ করে হিসাব করা। অর্থাৎ, তিন বছরের একটি শিশুকে ভারী খাবার হিসেবে তিন টেবিল চামচ করে সব্জি, ভাত ও ডাল পরিবেশন করা যায়। তবে শিশু খেতে চাইলে পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, একটি বাড়ন্ত শিশুর দৈনিক ১,৩০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। কোনো নির্দিষ্ট শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি হিসাব করার নিয়ম হচ্ছে শিশুর উচ্চতা হিসাব করে ক্যালরির পরিমাণ নির্ধারণ করা। সাধারণত শিশুর দেহের প্রতি ইঞ্চির উচ্চতার জন্য ৪০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। তাই একটি শিশুর উচ্চতা ৩৪ ইঞ্চি হলে তার দৈনিক চাহিদা হবে ১,৩৬০ ক্যালরি। কাজেই, শিশুর সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সঠিক খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্যালরির সঠিক বণ্টন তার অভিভাবককেই করতে হবে। বিশেষ করে শিশুকে তরল দুধ বা ফলের রস দেওয়ার বেলায় খেয়াল রাখতে হবে শিশুটি যেন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খেয়ে না ফেলে। অ্যামেরিকান একাডেমি অব পেডিয়েট্রিক্স-এর মতে, বাড়ন্ত শিশুদের জন্য দৈনিক দু'কাপ (৪৫০ ক্যালরি) গরুর দুধ ও এক কাপ (৯০ ক্যালরি) ফলের রস যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে কোনো শিশু যদি সারাদিনে ছয় কাপ দুধ খায় তাহলে সে তার দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদার ৭০ ভাগ দুধের মাধ্যমেই পূরণ করে ফেলে, ফলে অন্যান্য খাবারের প্রতি তার আর আগ্রহ থাকে না। এছাড়া মাত্রাতিরিক্ত চকলেট বা মিষ্টিজাতীয় খাবারও ক্ষুধা নষ্ট করে দেয়। তাই শিশুকে কখন কী খাবার কতটুকু পরিমাণে দিতে হবে তার একটি তালিকা আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখলে শিশুর পরিপূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করা যায়।

অভিভাবকদের করণীয়

যেসব শিশুর খাবারে অনীহা রয়েছে তাদেরকে খাবারের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে অভিভাবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে শুধু খাবারে বৈচিত্র্য আনাই যথেষ্ট নয়, খাওয়ার পরিবেশ, খাবার পরিবেশনের প্রক্রিয়া এবং বিশেষ করে শিশুর প্রতি অভিভাবকের সচেতন আচরণ ও সঠিক ভাষার ব্যবহারের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নিম্নলিখিত তালিকা দু'টি দেখে মিলিয়ে নেওয়া যায় অভিভাবক হিসেবে কোন কোন কৌশলগুলো অবলম্বন বা পরিহার করা প্রয়োজন:

যা যা করা দরকার

১. শিশুকে নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

২. বিভিন্ন বেলার ভারী খাবারের মাঝের সময়গুলোতে হালকা নাস্তা খুব সতর্কভাবে দিন, যেন শিশুর ক্ষুধা নষ্ট হয়ে না যায়। এক্ষেত্রে নাস্তার পরিমাণ কম হওয়া ভালো এবং খেয়াল রাখতে হবে নাস্তা ও ভারী খাবারের সময়ের ব্যবধান যেন দুই থেকে তিন ঘণ্টা হয়।

৩. কখনো কখনো শিশুকে নাস্তা দেওয়ার বেলায় তার পছন্দ জেনে নিন। যেমন, সে কলা খাবে না পেয়ারা খাবে তা জেনে নিয়ে তাকে তার পছন্দের খাবারটি দিন।

৪. শিশুকে নতুন ধরনের কোনো খাবার খাওয়াতে

চাইলে তা খাওয়ার শুরুতে পরিবেশন করুন। শিশুকে খাবারের স্বাদ, রং ও গুণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন, যাতে সে আগ্রহ বোধ করে।

৫. খাবারের প্রতি তার আগ্রহ বাড়াতে শিশুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি রং-বেরংয়ের ছবি আঁকা ছোট হালকা প্লেট, চামচ ও গ্লাসে তাকে খাবার পরিবেশন করুন।

৬. শিশু যদি একেবারেই খেতে না চায় তবে তার সামনে থেকে খাবার সরিয়ে ফেলুন এবং পরবর্তী খাবারের সময় না-হওয়া পর্যন্ত তাকে কোনো হালকা নাস্তা বা ফল দেবেন না।

শিশুটি নিজ হাতে খাবার খাচ্ছে এবং তার মা তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন

৭. শিশু সম্পূর্ণ খাবার শেষ করতে পারলে তার প্রশংসা করুন, এতে তার মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হবে।

যা যা করা উচিত নয়

১. জোড় করে শিশুকে খাবার খেতে বাধ্য করা উচিত নয়। এতে খাবারের প্রতি তার অনাগ্রহ বেড়ে যাবে।

২. শিশু খাবার খেতে না চাইলে তাকে বকা দেওয়া, বার বার অনুরোধ করা বা খেলতে খেলতে খাওয়ানোর অভ্যাস পরিহার করুন।

৩. শিশুকে কোনো কিছুর লোভ দেখিয়ে খাবার খাওয়ানো ঠিক নয়। এমনকি ভয়-ভীতি দেখিয়ে খাবার খেতে বাধ্য করলে মানসিকভাবে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪. খাওয়ার সময় পানি, জুস বা দুধ যতটা সম্ভব কম পরিবেশন করা ভালো।

৫. অভিভাবকরা অনেক সময়ই শিশুকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার খাওয়াতে চেষ্টা করেন এবং আশা করেন শিশুটি হয়তো তা খেয়ে ফেলবে কিন্তু এভাবে শিশুর ওপর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। শিশু যতটুকু খাবার গ্রহণ করতে পারবে তাকে ততটুকু খাবারই দেওয়া উচিত।

৬. খাওয়ার সময় হাতে খেলনা বা বই দেওয়া ঠিক নয়। টিভি বা গান ছেড়ে খাওয়ানোর অভ্যাস করবেন না। এতে খাবারের থেকে তার মনোযোগ সরে গিয়ে সে টিভি বা গানের প্রতি মনোযোগী হয়ে পরে। এতে সে হয়তো খাবার খাচ্ছে ঠিকই কিন্তু খাবারের স্বাদ বুঝতে পারে না ।

৭. শিশু কোনো বেলায় খেতে না চাইলে তাকে বিকল্প খাবার দেওয়া উচিত নয়। তাহলে নিয়মিত খাবারটি খেতে সে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে।

৮. শিশুরা সবসময় মনোযোগ পেতে চায় এবং একারণেও অনেকসময় খাবারের প্রতি অনাগ্রহ দেখায়। শিশু খেতে না চাইলে তা মেনে নিন এবং সে না খাওয়ায় আপনি যে হতাশ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছেন তা কিছুতেই বুঝতে দেবেন না, নাহলে সে মনোযোগ পেতে বারবার একই কাজ করবে।

শিশুকে খাবার খেতে উৎসাহিত করুন

খাওয়ানোর সময় অতিরিক্ত জোর-জবরদস্তি, অনুরোধ, রাগ দেখানো , হতাশা প্রকাশ শিশুর কাছে শাস্তিদায়ক বলে মনে হতে পারে। আবার অনেক শিশু খাওয়ার সময়টিকে অভিভাবকের মনোযোগ আকর্ষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। তাই খাবার খাওয়ানোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়টিকে পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে শিশুর খাবারের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রে যা করা যেতে পারে সেগুলো হলো:

- পরিবারের সবাই একসাথে বসে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। শিশু যখন অন্যদের খেতে দেখবে সে নিজেও তা অনুকরণ করে খেতে চেষ্টা করবে।
- শিশু নিজের হাতে খেতে চাইলে তাকে সে সুযোগ দিন এবং প্রয়োজনে তাকে সহযোগিতা করুন। এক্ষেত্রে শিশুকে তাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং কিছুটা এলোমেলো বা নোংরা হওয়াকে সহজভাবে মেনে নিন।
- নির্দিষ্ট সময়ে খাবার পরিবেশন করাটা খুবই জরুরী। এতে শিশু পারিবারিক শৃঙ্খলা শিখবে এবং সবার সাথে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খেতে অভ্যস্ত হবে।
- খাবার টেবিলে শিশুদের সাথে সহজ ও সাবলীলভাবে কথা বলুন। শুধু খাবার নিয়ে নয় অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করুন।
- খাবার পরিবেশনের ১০/১৫ মিনিট আগে থেকে শিশুকে জানিয়ে দিন খাবার পরিবেশন করা হবে, এতে শিশু খাবার খেতে মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবে।
- শিশু টেবিলে বসার আগেই খাবার টেবিলে পরিবেশন করুন যাতে তাকে অপেক্ষা করতে না হয়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় শিশু খাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- টেবিলে বসা এবং খাওয়ার নিয়মগুলো আস্তে আস্তে শিশুকে শেখান এবং নিজেও মেনে চলুন। এতে শিশু শুনে ও দেখে দু'ভাবেই শিখবে।
- ঠিকমতো খাবার শেষ করতে পারলে তার প্রশংসা করুন।

বড়দের মতোই বাড়ন্ত শিশুদেরও নিজস্ব ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতি রয়েছে। শিশুকে জোর করে খাওয়ার অভ্যাস করা হলে ভবিষ্যতেও অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের অভ্যাসটা থেকে যাবে। তাই শিশুকে সময় দিন এবং তার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিন। এতে সে সাবলীলভাবে খাদ্যগ্রহণ করবে, খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে এবং এই শিশুই দেখা যাবে পরবর্তীকালে তার পছন্দের খাবারগুলো নিজে থেকেই চাইবে। অভিভাবক হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো শিশু কী খাবে এবং কখন খাবে তা নির্বাচন করা কিন্তু শিশু নিজে সিদ্ধান্ত নেবে সে খাবে কী না বা কতটুকু খাবে। খেয়াল রাখতে হবে, খাবার না খাওয়ার প্রবণতা যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। তবে মন্দের ভালো এই যে, গবেষণায় দেখা গেছে, বাড়ন্ত শিশুদের খাবারের এই অনীহা ছয় থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে নিজে থেকেই মিটে যায়।

শারীরিক ক্রিয়াকলাপ: ক্রনিক ডিজিজ প্রতিরোধে আপনার ঢাল

লাবিবা মুস্তাবিনা, অগ্র সামাজিক সংস্থা
মনোয়ার জাহান, আইসিডিডিআর,বি

ক্রনিক ডিজিজ কী

যেকোনো রোগ ৬ মাসের বেশি স্থায়ী হলে তাকে ক্রনিক ডিজিজ বলে। এরমধ্যে হৃদরোগ, অতিশয় স্থূলতা, স্ট্রোক, ক্যান্সার, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত অসুস্থতা, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস অন্যতম। বর্তমানে এধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশি যে একে এক মহামারী হিসেবে অভিহিত করলেও বেশি বলা হবে না। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ৬০ শতাংশ মৃত্যু ঘটছে ক্রনিক ডিজিজের কারণে।

ক্রনিক ডিজিজের বিস্তৃতি

এটি খুবই উদ্বেগজনক যে, পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে ক্রনিক রোগ দেখা যাচ্ছে। এসব রোগের দ্রুত বৃদ্ধি বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এক বিশাল হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অলস জীবনযাপন প্রণালী, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক ত্রুটির কারণে এজাতীয় ক্রনিক ডিজিজে আক্রান্ত হচ্ছে উন্নত দেশের জনগণ। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে গত ২০ বছরে ক্রনিক ডিজিজ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্ক জনগোষ্ঠির প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ ক্রনিক ডিজিজে আক্রান্ত এবং এরা অতিরিক্ত ওজন বহন করছে। এদের প্রায় ১২.৬ মিলিয়ন জনগণ হৃদরোগে ভুগছে এবং আনুমানিক ১.১ মিলিয়ন জনগণ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১৭ মিলিয়ন লোক ডায়াবেটিসের ফলে অতিশয় স্থূলতা, অতিরিক্ত ওজন কিংবা শারীরিক অক্ষমতায় ভুগছে। সেখানে ১৯৮০ সাল থেকে যুবক-যুবতীদের মধ্যে অতিশয় স্থূলতার মাত্রা প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ হিসেবে দৈহিক পরিশ্রমের অভাবকে দায়ী করা হচ্ছে। সাধারণত আগে ধারণা করা হতো যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি আর ক্রনিক রোগের সমস্যা কম। এই ধারণা বর্তমানে আর বাস্তবসম্মত নয়। তবে, ক্রনিক ডিজিজের ব্যাপকতা বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও গ্রাস করছে। উদাহরণ হিসেবে নিম্ন আয়ের দেশ, যেমন: ভারত, পাকিস্তান আর মাঝারি আয়ের দেশ, যেমন: রাশিয়া ও চীনে সংক্রামক রোগে মৃত্যুর চেয়ে ক্রনিক রোগে মৃত্যুর ঘটনা ইদানিং বেশি দেখা যাচ্ছে। ২০০৫ সালে ২৩টি উন্নয়নশীল দেশে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ অসুস্থতার জন্য ক্রনিক ডিজিজকে দায়ী করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ২০১৫ সালের মধ্যে ক্রনিক ডিজিজের হার যদি একই মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে এসব রোগের চিকিৎসাবাবদ প্রায় ৮৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হবে।

কয়েকজন ভদ্রলোক ব্যায়াম করছেন, যা ক্রনিক ডিজিজ প্রতিরোধে অত্যন্ত সহায়ক
ছবি: সিসিসিডিবি

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে ক্রনিক রোগের ব্যাপকতার দিকে একটি পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রনিক রোগের ব্যাপকতা এদেশে অচীরেই মহামারী আকার ধারণ করবে এমন এক পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন প্রণালীর ফলাফল হিসেবে ক্রনিক ডিজিজ দিনদিন বিস্তার লাভ করছে এবং এর ফলে ঘটছে মৃত্যু। ক্রনিক ডিজিজের চিকিৎসা ব্যয় আমাদের জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে হুমকির সৃষ্টি করছে।

শরীরচর্চা ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপ

শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের মাংসপেশীর সঞ্চালন আমাদের সুস্থ থাকতে সহায়তা করে। নিয়মানুর্বতীতার সাথে হাঁটা, হালকা ব্যায়াম, খেলাধুলা, এমনকি গৃহস্থালীর সাধারণ কর্মকাণ্ড শরীরের জন্য উপকারী। এসবের দ্বারা দেহের যথাযথ বিপাক ক্রিয়ার ফলে দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমতে পারে না। শরীরচর্চার মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং বেশি মাত্রার গ্লুকোজ থেকে দেহকে রক্ষা করা যায়। এর পাশপাশি শারীরিক ক্রিয়াকলাপ দেহের হাঁড়কে মজবুত রাখে, হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে এবং ক্রনিক ডিজিজ প্রতিরোধ করে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

শরীরিক ক্রিয়াকলাপ বলতে শুধু অত্যাধিক ব্যায়াম কিংবা অক্লান্ত পরিশ্রমকেই বুঝায় না। সপ্তাহে অন্তত তিন থেকে পাঁচবার ৩০ মিনিট করে হাঁটা কিংবা হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে। একবারে করা সম্ভব না হলে দিনের বিভিন্ন সময় মিলিয়ে প্রতিদিন অন্তত ৩০মিনিট তা করা যায়। হাঁটা, পুষ্টিকর সুষম খাবার গ্রহণ, কাজের মাধ্যমে শরীরের পেশী সঞ্চালন করা, ওজন ঠিক রাখা, গাড়ি ব্যবহারের পরিবর্তে সাইকেল চালানো, লিফট ব্যবহরের পরিবর্তে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, প্রভৃতি অত্যন্ত কার্যকর।

সরকারিভাবে বা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণার সাহায্যে শরীরচর্চা ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ক্রনিক ডিজিজ প্রতিরোধে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ভুমিকা সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে। শৈশব থেকে স্কুলে শারীরিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। ক্রনিক ডিজিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবিষয়ে গবেষনামূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুফল লাভ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে আইসিডিডিআর,বি-র অধীনস্থ Centre for Control of Chronic Disease in Bangladesh (CCCDB) গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শরীরচর্চার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে শরীরচর্চা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব ক্রনিক ডিজিজ এড়িয়ে চলতে পারি এবং সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারি।

কচি ঘাঘরা শাক থেকে সাবধান!

মোঃ সাইফুল ইসলাম
আইসিডিডিআর,বি

আমরা সবাই বিভিন্ন ধরনের শাক খেয়ে থাকি। আমিষজাতীয় খাবারের পাশাপাশি শাক-সব্জি খাওয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, কারণ এগুলো হরেক রকমের ভিটামিনে ভরপুর। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত-খামারে পরিকল্পিত উপায়ে নানা ধরনের শাক উৎপাদিত হয় এবং এসব শাক প্রতিনিয়তই বাজারে পাওয়া যায়। অপরদিকে, গ্রামীণ এলাকায় সবসময়ই আবাদি জমিতে ফসলের পাশাপাশি এবং অনাবাদি জমিতে কিছু চারাগাছ প্রাকৃতিকভাবে অনেকটা আগাছার মতো বেড়ে ওঠে, যা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। গ্রামের নিম্ন আয়ের লোকজন প্রায়ই এসব শাক খেয়ে জীবনধারণ করে থাকে। এরকমই একটি অজত্নে বেড়ে ওঠা শাক হলো ঘাঘরা শাক, যা আমরা অনেকেই চিনি না বা এটি যে অত্যন্ত বিষাক্ত, তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

ঘাঘরা শাকের চারা ও পূর্ণাঙ্গ ঘাঘরা শাক

ঘাঘরা শাক কী

সাধারণত হাওড় এলাকায় ভেজা বা আদ্র জমিতে এবং নদীর ধারে বিনাযত্নে ঘাঘরা শাক বেড়ে উঠতে দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে এই শাক ঘাঘরা, আগরা এবং হাগরা নামে পরিচিত। ঘাঘরা শাকের বৈজ্ঞানিক নাম *Xanthium strumarium*। এই শাকের পাতাগুলো উজ্জ্বল সবুজ রঙের হয়ে থাকে এবং চারা অবস্থায় এর কাণ্ড সবুজ ও লালচে এবং নরম প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ঘাঘরা শাক সম্পর্কে কিছু কথা

২০০৭ সালে সিলেটে আকস্মিকভাবে ৮১ জন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে ১৯ জন মারা যায়। বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আইসিডিডিআর,বি তাদের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে পায়, কচি ঘাঘরা শাক খাওয়ায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। কচি ঘাঘরা শাকে যখন দুই থেকে চারটি পাতা গজায় তখন এটি খুবই বিষাক্ত থাকে। কচি ঘাঘরা শাকে carboxyatratyloside-নামক এক বিষাক্ত পদার্থ থাকে যা প্রাণীর দেহে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে অসুস্থতার সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। দেখা গেছে, ঘাঘরা শাক যত ছোট অবস্থায় থাকে তাতে বিষের পরিমাণ তত বেশি থাকে। ঘাঘরা শাকের চারাগাছ বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এতে বিষের পরিমাণ কমতে থাকে। পূর্ণাঙ্গ ঘাঘরা শাক ভেষজ উপাদান হিসেবে বিভিন্ন কবিরাজী ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিষক্রিয়ার কারণে যা ঘটতে পারে

ঘাঘরা শাকের বিষক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে তা নিম্নরূপ:

- প্রচুর বমি হওয়া
- প্রচণ্ড দুর্বল অনুভব করা
- জ্বর
- ডায়রিয়া
- শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা
- খিঁচুনি
- পেটে ব্যথা
- মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা
- অচেতন হয়ে যাওয়া

বেশি পরিমাণে কচি ঘাঘরা শাক খাওয়ার ফলে বিষক্রিয়ার মাত্রা বেশি হলে মানুষ বা যেকোনো প্রাণীর দ্রুত মৃত্যু ঘটে। রান্নার মাধ্যমেও কচি ঘাঘরা শাকের বিষাক্ত উপাদান পুরোপুরি দূর হয় না। কাজেই, এই শাক দিয়ে রান্না-করা যেকোনো খাবার খাওয়াও অত্যন্ত বিপদজনক।

কীভাবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু এড়ানো যায়

নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অবলম্বন করে ঘাঘরা শাকের দ্বারা সৃষ্ট অসুস্থতা বা মৃত্যু এড়ানো যায়:

- নিজে ঘাঘরা শাক চিনতে হবে এবং অপরকে চেনাতে হবে
- ঘাঘরা শাকের বিষের কথা পরিচিত মহলে জানাতে হবে
- কচি ঘাঘরা শাক তোলা যাবে না
- কচি ঘাঘরা শাক খাওয়া যাবে না এবং অপরকে এটি খাওয়া থেকে বিরত করতে হবে
- অন্য শাকের সাথে কচি ঘাঘরা শাক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না
- অন্য কোনো শাক-সব্জি বা মাছ-মাংসের সাথে ঘাঘরা শাক দিয়ে রান্না-করা খাবার খাওয়াও নিরাপদ নয়

শুধুমাত্র আমাদের সচেতনতার মাধ্যমেই ঘাঘরা শাকের দ্বারা সৃষ্ট অসুস্থতা বা মৃত্যু এড়ানো যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ঘাঘরা শাকের বিষের ব্যাপারে নিজে সতর্ক থেকে এবং অপরকে সাবধান করে বড় ধরনের বিপর্যয় প্রতিরোধ করা সম্ভব।